তারিখ ... 14 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

কালের কণ্ঠ

বিমল সরকার ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি

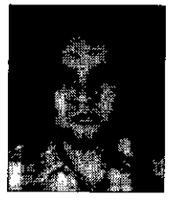

এরশাদের পতনের পর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। তখন থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় সভাপতি বানানোর একটা হিড়িক পড়ে যায়। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর স্তরের কলেজ ও মাদ্রাসা—এক কথায় সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মনোযোগী শিক্ষার্থীমাত্রই বোধ করি অবহিত আছেন যে ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধান সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের ওপর কী পরিমাণ ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছে। একটি কথা যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে প্রচলিত যে ব্রিটেনের সংবিধান অনুযায়ী সে দেশের প্রধানমন্ত্রী একমাত্র নারীকে পুরুষ আর পুরুষকে নারীতে পরিণত করা ছাড়া আর সব কিছুই করতে পারেন। আমেরিকার ক্ষেত্রে বলা হয়, সে দেশের সংবিধান দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানানো ছাড়া তাদের প্রেসিডেন্টের ওপর অন্য সব কিছু করার ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে আমাদের বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির ক্ষমতা ও এখতিয়ার প্রায় একই রকম; হেন কোনো কর্ম বাদ নেই যা করতে পারে না। বলে রাখা ভালো, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির যাবতীয় কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয় মূলত সভাপতিকে কেন্দ্র করে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতি ও সদস্য নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থাটি সচেতন মহলে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে আসছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যে কী পরিমাণ অসুবিধা, বিশৃঙ্খলা ও দুঃসহ দুর্ভোগ-বিড়ম্বনা ও জাতীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে তা অল্প কথায় বা স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না।

বলতে গেলে আশির দশকজুড়েই লক্ষ করা গেছে, সরকারি কর্মকর্তারা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন—ডিগ্রি স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোয় (কলেজ ও মাদ্রাসা) জেলা প্রশাসক আর মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা। ডিগ্রি (স্নাতক) স্তরের কলেজ ও মাদ্রাসার সভাপতি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা কখনো দায়িত্ব পালন করলেও তা জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি হিসেবেই। এ সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয়, বিশেষ করে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় সরাসরি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ খুব একটা লক্ষ করা যায়নি। এরশাদের পতনের পর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। তখন থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি বানানোর একটা হিড়িক পড়ে যায়। মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ডিগ্রি বা স্নাতকোত্তর স্তরের কলেজ ও মাদ্রাসা—এক কথায় সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সংসদ সদস্য, উপমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি—আরো কত রকমের অবস্থান একেকজনের। একইভাবে সংসদ সদস্য বা উল্লিখিত পদ-পদবিধারীদের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজি (মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর) ও শিক্ষা বোর্ড মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবেও মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরই ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সদস্য করা শুরু হয়। এ ছাড়া অভিভাবকদের সরাসরি ভোটে সদস্য নির্বাচনের সময়ও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে দলকে ভারী করার চেষ্টা করা হয়। এসবের ফলে সরকারদলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির কাছে এক ধরনের জিম্মি হয়ে পড়ে একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

রাজনৈতিক বিবেচনায় সভাপতি নিয়োগের ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের দৃষ্টি ও আলোচনায় আসে ২০০৭ সালে ওয়ান-ইলেভেনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। পাঁচটি নয়, ১০টি নয়, ২০টিও নয়, একেকজন সংসদ সদস্যকে এমনকি ৩০-৪০টি পর্যন্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সভাপতি বানানো হয়েছিল জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬)। সংসদ সদস্য ছাড়াও নিছক রাজনৈতিক বিবেচনায় একই ব্যক্তিকে ডজন ডজন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করা হয় এ সময়। লাগামহীন স্বেচ্ছাচারের ফলে একেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিনে দিনে অনিয়ম, অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি আর নৈরাজ্যের উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-২০০৮) ক্ষমতা গ্রহণ করেই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এসব নিয়োগ বা পুরো কমিটি সরাসরি বাতিল করে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে নতুন করে কমিটি গঠন ও কমিটির সভাপতি হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করে। পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর (২০০৯ ও ২০১৪) পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে আগের মতোই আবারও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অবশ্য বর্তমানে সংসদ সদস্যদের সভাপতি থাকার এখতিয়ারটি কিছুটা সীমিত রাখা হয়; বলা হয় একই ব্যক্তি (সংসদ সদস্য) সর্বোচ্চ চারটির বেশি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে থাকতে পারবেন না। তবে তাঁর চাহিদাপত্র (ডিও) অনুযায়ী নির্বাচনী এলাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতিদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থাটি অপরিবর্তিত রাখা হয়।

শুধু সভাপতি নিয়োগ নয়, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্থানীয় সংসদ সদস্য তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করে থাকেন। তাঁদের ইচ্ছা বা পছন্দের বাইরে অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকদের কোনো ক্যাটাগরিরই একটি নামও প্রস্তাবাকারে ওপরে পাঠানোর সুযোগ থাকে না।

লক্ষ করার বিষয়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভাপতি নিয়োগ তথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টির পরিবর্তনের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে, বলা যায় একেবারে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকেই প্রতিবছর একবার করে হলেও খোদ সরকারপ্রধানের সুদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে আসছেন সরকারি কর্মকর্তারা। তাঁর উপস্থিতিতে দুই বা তিনটি কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত নিজেদের সম্মেলনে জেলা প্রশাসকরা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি সব সময় কখনো সরাসরি আবার কখনো বা অন্য কোনোভাবে বিষয়টি উত্থাপন করে আসছেন। প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে এ সবকিছুরই বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে তত্ত্বাবধায়ক বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছাড়া রাজনৈতিক সরকারের আমলে বিষয়টির কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, জেলা প্রশাসকরা উপর্যুপরি এই যে রাজনীতিকদের স্থলে সরকারি কর্মকর্তাদের সভাপতি করার জন্য দাবি জানিয়ে আসছেন তা কি শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের হৃত কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার বা নতুন করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পোক্ত করার জন্যই? আমার কাছে আসলে এমনটা মনে হয় না। জেলা প্রশাসকরাও একেকজন আমাদের সমাজব্যবস্থার অধীন কৃষক অথবা সাধারণ পরিবারেরই সন্তান বলে মনে করি। তাঁর বাড়ি, গ্রাম বা এলাকার শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নানা অসুবিধা ও দুঃসহ দুর্ভোগ-বিড়ম্বনার বিষয়টি তাঁদের প্রতিনিয়ত ভাবায় না তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ ছাড়া জেলার চৌহদ্দিতে সংঘটিত ছোট ও বড়, সরল ও জটিল—সব কিছুই তাঁর সরকারি দায়িত্বেরই আওতাভুক্ত। আর এ জন্যই তাঁদের পক্ষ থেকে সরকারপ্রধানের কাছে বারবার বিষয়টি উত্থাপন করার প্রয়াস। কারণ জেলা প্রশাসক বা সরকারি অন্যান্য কর্মকর্তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না থাকলেও 'শিক্ষানুরাগীদের' পারস্পরিক স্বার্থের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সময় সময় সংঘটিত হাতাহাতি, লাঠালাঠি, কোপাকুপি, মাথা ফাটাফাটির পর সবাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে তাঁদেরই শরণাপন্ন হন।

এ কথাও ঠিক, সরকারি কর্মকর্তাদের বেশির ভাগই ধোয়া তুলসী পাতা নন। তবু তাদের ওপর মোটামুটি আস্থা রাখা যায় এ কারণে যে শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কার-অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে তাঁরা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। ইচ্ছা করলেও তাঁরা বেপরোয়া হবেন না, হতে পারবেন না। এ ছাড়া তাঁদের মধ্যে রাজনীতি-নির্ভরশীলদের মতো চাই-চাই, আরো চাই বা খাই-খাই ভাব থাকবে না। তাঁদের মাথায় একধরনের জবাবদিহি সব সময় কাজ করে। কোনো বিষয় না জেনেও বোঝার ভান করা বা অযথা গোঁয়ার্তুমি করার প্রবণতা থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা সচেতন থাকেন। তাঁরা এ-ও ভালো জানেন যে কোন কাজটি তাঁর এখতিয়ারে আর কোনটি এখতিয়ারের বাইরের। ভালো করে না জেনে ও না বুঝে শুধু জেদের বশবর্তী হয়ে লড়তে গিয়ে প্রতিবছর কী পরিমাণ মামলায় যে একেকটি কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল হতে হচ্ছে তা বোধ করি সহজে বলে শেষ করা যাবে না। আমরা চাই দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কমিটিতে সভাপতি হিসেবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণীরা আসুন। তা করা সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত অন্তত সরকারি কর্মকর্তাদের এ আসনে বসানো হোক।

লেখক : কলেজ শিক্ষক